Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.70-82
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রেম ও সৌন্দর্যের অনন্য মিশেল: মধ্যযুগের রোমন্টিক প্রণয়োপাখ্যান

কানিজ ফাতেমা
গবেষক(পি.এইচ.ডি),বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

Abstract

Romantic inspirations are a major part of The Middle Ages Bengali literature. These poems, written by the great poet of the gods, are deeply focused and in the love of the poets by the light of human understanding. The new craze in literature is evidenced by the transformation of traditional religious culture into the upper chest of romantic traditions. Life-related feeling has come with new dimensions here. The pair of poems also have a pair of poems to satisfy the eternal aspirations of love and beauty. In these poems, which are based on the spirit of spirituality, they have given more importance to man than to religion and to god. Although the magic of the romans is spread by the magic of the world, in the end, human beings are the heroes of poetry. The unique blend of love and beauty has been greatly promoted by talented poets in their self-reliance, in the innate, in the mind-blowing language, in the expanding vocabulary, in the form of a linguistic and skillful technique; Which today was able to stop the thirst of the reader's poetry.

Key words: Romantic, literature, religious, poetry, magic.

ধর্মের মোড়ক উন্মোচন কিংবা কর্মের বাণী বহন করা সাহিত্যের কাজ নয়। আবার সাহিত্যের কাজ ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় সমাগ্রীর মতো দর্শন-ইন্দ্রিয় গোচর কোন বিষয়ও নয়। সাহিত্য মূলত নিত্যতার উর্ধ্বে উঠে রসোপলব্ধির অনিত্য বাসনাকে ধরাধামে অবতীর্ণ করতে সহায়তা করে। আর কংকালের কাঠিন্য ভেদ করে মানুষের মননশীল মনের পেলব চরে সহস্র রঙের ফোয়ারা ঝরায়। ভাবলোককে ভালোবাসার শাশ্বত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার মোক্ষম হাতিয়ার সাহিত্য। যুক্তির নেপথ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আবেগকে মানুষের মননে উন্মোচিত ও মনে সঞ্চারিত করে সাহিত্য। মধ্যযুগে এই সাহিত্য আপনার রঙ-রূপ ও রসের প্রকাশ করে কাব্যকে আশ্রয় করে। যার একটি ধারা বয়ে চলে ধর্মের দিকে অন্যটি যায় রসের দিকে। তবে যে মোড়কেই সাহিত্য আপনাকে প্রকাশ করে না কেন; তার মাঝে মানব-মনের বিগলিত ভাবনার শাণিত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের শুরুটায় সাহিত্যের আকাশ ছিল কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন। রাজনৈতিক ও সামাজিক ডামাডোলে সাহিত্য তার আপন ছন্দে আনন্দ বিতরণ ভুলে গিয়ে হয়ে পড়েছিল কিছুটা কোনঠাসা। যদিও সে অবস্থার অবসান ঘটে বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবেই। অবরুদ্ধ চেতনা বাঁধ দেওয়া পানির মতো সুযোগ পেয়ে সব বাঁধা পেরিয়ে সহস্র ধারায় ছুটে চলে নানা পথ ও মতকে আশ্রয় করে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যযুগের সাহিত্য আপন শক্তিকে বহুগুণ বর্ধিত করবার অভিপ্রায়ে অনুবাদের করতল আঁকড়ে ধরে। কারণ অনুবাদের বৈশিষ্ট্য হলো সমৃদ্ধতর ভাষার ভাব ও ভাবনার আলোকে আপন ভাষার 'বহন ও সহন' ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা। মধ্যযুগের সাহিত্যিকগণ নিপুণ হস্তে সে কাজটি সুসম্পন্ন করে আদি মধ্যযুগে ভাষা ও সাহিত্যের একটি শক্ত ভিত প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে তার উপর গড়ে ওঠে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য, চরিত সাহিত্য, দোভাষী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, শাক্ত পদাবলীর মতো সমৃদ্ধ সব সাহিত্যিক ধারা। এর মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্নতা নিয়ে যে ধারাটি আপন রঙ-রস ও বৈভবে ছিল অনন্য সেটি 'রোমান্টিক প্রনয়োপাখ্যান' এর ধারা। প্রেম ও সৌন্দর্যের অনন্য মিশেলে তৈরি এ সকল প্রণয়-আখ্যানসমূহে মানুষের মৌলিক আকাক্সক্ষার সাথে সাথে সৌন্দর্যের প্রতি অনন্ত আসক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ফল্গুধারার মতো এসব কাব্যের অন্তর চিরে বয়ে গেলেও মর্তের মানুষে মানবিক বাসনা-ই এখানে অধিক সক্রিয় থেকেছে।

ধর্মের আরাধনা ও দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনের বিপরীতে গিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানসমূহ মানবহৃদয়বৃত্তি, চিত্তবিলাস ও মানসসম্ভোগের বিচিত্র লীলা প্রকাশের মাধ্যমে সে যুগের গতানুগতিক শিল্পকর্মের ধারায় নতুন রস ও আনন্দ সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়। প্রণয়োপাখ্যানগুলির মুখ্য রূপকার ছিলেন মুসলমান কবিগণ। পুনরাবৃত্তিমূলক ধর্মীয় পরিবেশের বাইরে থেকে মুসলমান কবিগণ প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে নতুন ভাব, বিষয় ও রসের যোগান দিয়ে স্বতন্ত্র্য কাব্য ধারার প্রবর্তন করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক নতুনতর ঐতিহ্যের সংযোজন করেন। ফলে বাঙালি পাঠক প্রথম ধর্মভাবমুক্ত মানবিক রসের আস্বাদ লাভ করে। রোমান্টিক কাব্যধারার যেসব উল্লেখযোগ্য কবি ও কবিতার তালিকা নিম্নরূপে দেখন হলো:

কাব্য	কবি	কাল
ইউসুফ জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	পনের শতক
লায়লী মজনু	দৌলতউজির বাহরামখান	ষোল শতক
মধু মালতী	মুহম্মদ কবির	ষোল শতক
হানিফা কয়রাপরী	শাহ বারিদ খান	ষোল শতক
বিদ্যাসুন্দর	শাহ বারিদ খান	ষোল শতক
সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান	দোনা গাজী চৌধুরী	ষোল শতক
সতীময়না লো চন্দ্রনী	কাজী দৌলত	সতের শতক
পদ্মাবতী	আলাওল	সতের শতক
সপ্তপয়কর	আলাওল	সতের শতক
চন্দ্রবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর	সতের শতক
গুলে বকাওলী	নওয়াজিম খান	সতের শতক
মৃগবতী	মুহম্মদ মুকিম	আঠার শতক
গদা মল্লিক	শেখ সাদী	আঠার শতক

বাংলার বাইরে বেরিয়ে এসব কাব্যে কবিরা আরব্য কাহিনী, পারস্য জীবন ও ভারতের নানা প্রদেশের চালচিত্রকে ধারণ করে মহৎ ভাব, গম্ভীর ভাষা ও রোমান্স রসের আমদানী করেছেন। বাংলার বিভূতি এসব কাব্যে ধারণ করার অভিপ্রায় না থাকলেও কাব্যসমূহের অন্তরে বাংলার মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্য দারুণভাবে বিকশিত হয়েছে। কারণ কবিমন অনুবাদের কঠিন-প্রান্তর ত্যাগ করে বারংবারই আপন মানসচেতনার তাগিদ হতে আনন্দ-ভ্রমণে বের হয়েছে। এবং তারই ফাঁকে অপরিচিত পথে ভিনদেশী আলখেল্লায় জড়ান চরিত্রগুলো বাংলার সাধারণ মানুষের প্রবণতাকে আত্তস্ত করে নিয়েছে। এতে বোঝা যায়, কবি মন কাব্যের মাঝে কেবল বিনোদনের পথ খোঁজেন না, আপন প্রাণের ঐশ^ র্যকে ঢেলে দেন। দেশ-বিদেশের নানান ভাষা হতে সংগৃহীত এ সকল অনুবাদ কাব্যের জনপ্রিয়তা ও নান্দনিক শৈলী বুঝিয়ে দেয় ভিন্ন সংস্কৃতির বীজ গ্রহণ করে নিজ মাটিতে তাকে রোপন করে মহীরূহ নির্মাণে কতখানি পারদর্শি ছিলেন সে সময়ের কবিরা।

প্রাচীনযুগে তিনটি কারনে বর্হিদেশের সাথে বাংলার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল-রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বিস্তার, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, ধর্মপ্রচার ও তর্থযাত্রা। এসকল কারণে যোগাযোগের সাথে সাথে বাংলায় প্রবেশ করে আরব-ইরানের মুসলমানরা। এদেশে তারা শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আসন স্থাপন করলেও নিজ সাহিত্য-সংস্কৃতির সুধা স্রোতকে প্রবাহিত করতে দেন এ অঞ্চলে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকগণ বিদেশী কাঁচামাল ব্যবহার করে দেশীয় আমেজে রচনা করেন বিভিন্ন প্রণয়োপাখ্যান। ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ রাজারা শিল্প সাহিত্যের চর্চা করতেন অবসর মুহুর্তের চিত্তবিনোদনের জন্য। নিছক রসসম্ভোগ ছিল অধিকাংশ রাজার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্য। সেজন্য রাজসভার ছত্রছায়ায় যেসব শিল্প সাহিত্যের চর্চা হয়েছে সেগুলোতে রাজসভার রূপ, বৈদগ্ধ্য ও রসোল্লাস প্রধান্য পেয়েছে। প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে ক্ষমতার দম্ভ ও সম্ভোগের বর্ণিল চিত্র আছে। তার প্রধান কারণ পৃষ্ঠপোষক রাজাদের জীবনচেতনা ও

ভোগবাসনা। এতে প্রেম, সৌন্দর্য বিলাসীতা, দুঃসাহসিকতা, এ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি উপাদান স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। বাংলার কবিরা এসকল কাব্যে মানবপ্রেমকে প্রাধান্য দান করলেও সে প্রেম ছিল ভোগমুখী ও মিলনাত্মক। আনন্দ-মধুর অবসর-উপভোগ মুহূর্তে যে কাব্যশিল্পের জন্ম, তাতে তত্ত্বকথা, ধর্মকথা অপেক্ষা প্রেমকথা, রসকথা থাকাই স্বাভাবিক। অমাত্যবর্গের তোষামদ, চাটুকারবৃত্তি ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসামুখর পরিবেশে রচিত এ কাব্যে তাই রাজাদের যাপিত জীবন নানামাত্রিক অভিজ্ঞান ও বিভূতি নিয়ে বিস্তার লাভ করে। তবে ক্ষীণধারায় হলেও সেখানে বহমান ছিল মানবিকতা ও কবি-মনের আকূতি।

মধ্যযুগের প্রণয়োপাখ্যানকে 'রোমান্টিক' কাব্য বলা হয়। মানুষের প্রেমকথাই এ যুগের রোমান্টিকতার মূল উপাদান। এতে প্রেমাকুলতা, রূপতৃষ্ণ, ঐশ^ র্যসুখ, ভোগবাদ, আত্মতৃপ্তি, অহংবোধ, রাগ-ক্ষোভ প্রদর্শন, দুঃসাহসিক কর্ম, রোমঞ্চিত ও অবাধ দেহমিলনের কথা বলা আছে। যা রোমান্টিকতার বিষয়গত উপাদান। যুক্তি দিয়ে জানবার, বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয় নয়। হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার ও মন দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয়। বাস্তব অবাস্তব, লৌকিক-অলৌকিক সত্য-কল্পনার মিশ্রিত প্রেমময় জীবনকাব্যই সে যুগের রোমান্টিক কাব্য। বুড়িগঙ্গা হতে নীলনদ পর্যন্ত কাব্যগুলির পটভূমি বিস্তৃত। কোন কোনটির বাস্তব-ভিত্তি থাকলেও তা অতীত স্মৃতিতে বিলীন। তাদের প্রেমকথা কিংবদন্তী হয়ে বেঁচে আছে। প্রেমাখ্যানগুলোর জীবনকথা বর্ণনায় কবিদের কল্পনা রঙিন ডানায় ভর করে অপ্রাকৃত জগতে প্রয়াণ করার ফলে তাতে প্রচুর পরিমানে অলৌকিক উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নির্জলা প্রেমের ব্যথা কাব্যে থাকলেও ব্যথা পরবর্তি মিলনকেই এখানে প্রাধান্য দান করেছে বেশি। প্রেমের জন্য দুঃসাহসিক অভিযান এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত দেখান হয়েছে। তবে লায়লী মজনু ব্যতীত সর্বত্রই পরিনামে মিলন দেখান হয়েছে। কারণ যাদের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা তারা ব্যর্থতা চিত্র দেখতে চাইতেন না। ফলে সফলতার পথে সকল বাঁধা কল্পনার দ্বারা অপসরণ করা হয়েছে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এসকল কাব্যে একবিন্দুতে এসে মিশেছে। স্বপ্ন ও বাস্তব হাত ধরে হেঁটেছে একসাথে। বাস্তবের বাঁধা স্বপ্নে দূরীভূত হয়েছে। রতি ও রসের ভরপুর জোগান দিতে গিয়ে কবিরা অসাধ্যকে সাধন করেছেন। বাস্তবের কাঠিন্যকে ত্যাগ করে অবাস্তব ও অলৌকিকতার বাষ্পীয় ভুবনে প্রবেশ করেছেন। রাজারাজড়াদের ভাব ও ভোগের খোরাক এসকল কাব্য সে যুগে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে কিছুটা ব্যর্থ হন। কারণ মূলত তিনটি- এক. অভিজাত শ্রেণির মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি এ সকল কাব্য সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনি । তাদের হৃদয়কে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে তোলবার গুণ সেগুলোতে ছিল না। দুই. উপাদানের দিক থেকে এগুলো বিদেশী রয়ে গেছে। কাব্যকাহিনী ও ভাবপরিমণ্ডলে যে রূপ-চিহ্ন আছে, তার সাথে এদেশের জীবন ধারা, রূচিবোধ ও চিন্তাকর্মের যোগসাজুজ্য পাওয়া যায় না। তিন. ধর্মীয় গোঁড়ামী বা কুসংস্কারচ্ছন্নতা। মধ্যযুগে রোমান্টিক কাব্যগুলো প্রধানত অনুবাদ আকারে আবির্ভূত হয়। দু'একটি ছাড়া সবই মুসলমান কবির রচনা । এযুগে বিপুল পরিমান অনুবাদ হবার কারণে একে অনুবাদের যুগও বলা হয়। মুসলমান কবিগণ ইসলামি ঐতিহ্যের সূত্র ধরে আরবি-ফারসি কাব্যের অনুবাদ করেন। তাদের মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীর, বাহরাম খান, শাহ বারিদ খান, দোনা গাজী চৌধুরী, আলাওল, আব্দুল হাকিম অন্যতম । অন্যদিকে হিন্দুরা মৌলিকভাবে হিন্দু ঐতিহ্যের সূত্র ধরে সংস্কৃতের চর্চা করেন। এদের মধ্যে কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, কাশীরাম দাস উল্লেখযোগ্য। তাঁদের লেখনীতে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়। ফলে একপক্ষ অন্যপক্ষের ধর্মকথা পড়াকে পাপ মনে করত। ধর্মকথা শোনার ক্ষেত্রে এ নীতি মেনে চলা অনুচিত না হলেও রসকথাতেও এদেশের সে ভেদরেখা ভুলে যেতে পানে নি। এবং এ সকল নেতিবাচক সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে সাহিত্যে।

তবে সূক্ষভাবে পরখ করলে দেখা যায় আরব, ইরান, আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্যের কাহিনী এদেশের রঙ-রস-রুচি ও মনোভঙ্গির মাঝে পড়ে আদি আধ্যাত্মিকতাকে অনেকাংশে ঝেড়ে ফেলে মানবিক প্রেমকাব্যে পরিণত হয়েছে। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান চন্দ্রাবতী, মধুমালতী, লোর-চন্দ্রানী, পদ্মাবতী, বিদ্যাসুন্দর, হানিফা-কয়রাপরীর প্রমুখ চরিত্রের আচার আচরণ, কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা, সুখ-দুঃখানুভূতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, সংস্কার-বিশ্বাস এককথায় সামগ্রিক জীবনচর্চার মাঝে বাংলার সোঁদা গন্ধের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। সেই সাথে প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার মাঝেও বাংলার মা-মাটি ও মানুষের ছায়াকে অস্বীকার করা যায় না।। এজন্য গ্রন্থগুলো আক্ষরিক অনুবাদের বর্ম ছেড়ে প্রায় মৌলিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। পদ্য আকারে লিখিত এ কাব্যগুলো বর্ণনামূলক আখ্যানধর্মী রচনা। একে প্রকারন্তে কাহিনী কাব্যও বলা যেতে পারে। প্রণয়োপাখ্যানগুলোর বেশির ভাগেই কবিগণ দ্বিপদী ও ত্রিপদী পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'পাঁচালি রীতি' তে রচিত এই আখ্যানসমূহ মূলত পঠিত হওয়ার জন্যই রচিত হয় এবং বৈচিত্র সৃষ্টি কওে শ্রোতাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে গান পরিবেশনার ব্যবস্থাও করেছেন কবিগণ। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে পদ্যআকারে লিখিত বর্ণনা মূলক আখ্যানধর্মী প্রনয়োপাখ্যান এর মৌলিক বিষয় মানব প্রেম। সেই প্রেমকে কেন্দ্র করে নানা দুঃসাহসিক অভিযান, অলৌকিক

ঘটনার বিস্তার, কল্পনার অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জন, প্রেম ও রতির গাঢ় সহাবস্থান ইত্যাদি বিষয়সমূহ অবাধে বিস্তার করেছে। যা দুঃখ-কষ্টময় বিবর্ণ পৃথিবীর গ্লানি হতে কিছুটা সময়ের জন্য মানুষের মনকে পাখির পালকের পেলব ও উষ্ণ ওমে জড়িয়ে রাখার আনন্দ দেয়। কল্পনার সহস্র ফোয়ারা বাস্তবের ধূলি-মলিন রুক্ষতাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে তেপান্তরের পানে। জীবন এখানে কল্পনার সপ্তরঙে মোড়ান । কারণ প্রনয়োপাখ্যানগুলোর মূল আবেদন ছিল Entertainment বা বিনোদন। অনেক স্থানে উপদেশমূলক হলেও বিনোদনকে তা ছাড়িয়ে যায়নি। এগুলো কোন ঐতিহাসিক ঘটনার নাম কিংবা প্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে নি। বিনিদ্র রজনীর রাতজাগা উচ্ছ্বাসকে উল্লাসে ভরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে সর্ব প্রকার মাল-মশলা মিশিয়েছেন কবিগণ। মানবের ইন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষার দাবীর সাথে সযত্ন আনন্দের দারুণ মিশেলে কবিতাগুলো অসাধারণ নান্দনিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। আশিক-মাশুক তত্ত্বের দুর্বোধ্যতায় পরিস্নাত হলেও শেষ পর্যন্ত কাব্যসমূহ অলৌকিক মায়াবাস্তবতা ঝেড়ে মানবিক বোধে দীপ্ত হয়ে ওঠে। সংকেত-চিহ্ন-মিথ ইত্যাদি রূপকল্প দ্বারা অপার শান্তি ও অখ- সুখের দ্যোতনা নিয়ে সৃজিত রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলোকে অর্থনির্দেশনায় ও কাব্যব্যঞ্জনার দ্যুতিতে করেছে অনন্য। এখন এসকল লক্ষন এর আলোকে মধ্যযুগের কবিগণ যে সকল প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন, তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা যা আজও কিংবদন্তী হয়ে বেঁচে রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো:

ইউসুফ-জুলেখা: বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর (পনের শতক) 'ইউসুফ-জুলেখা' রচনা করে রোমন্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) সভাকবি। তিনি সুলতানের নির্দেশে কিতাব-কুরআন থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে প্রেমের মাধ্যমে ধর্মের বাণী শোনাবার জন্য দীর্ঘ এ আখ্যানকাব্য রচনা করেন। কুরআনে ইউসুফ-জুলেখার প্রেমকাহিনীর মাধ্যমে নীতিশিক্ষা ও আল্লাহর মহিমা প্রচার করার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা মানবপ্রেমের আবেগ-উচ্ছ্বাসময় গীতিকায় পরিণত হয়েছে। সেই সাথে ইসলামের বিজয়গৌরবও কীর্তিত হয়েছে সুন্দরভাবে। গ্রন্থের শেষে ইউসুফের ভ্রাতা ইবন আমিন ও বিধুপ্রভার অলৌকিক প্রেমকথা রয়েছে। যা সম্পূর্ণ কবির নতুন সংযোজন। শাহ মুহম্মদ সগীর ছাড়াও মধ্যযুগের আরো অনেক কবি ইউসুফ-জোলেখা নাম দিয়ে কাব্য রচনা করেন। তাঁর মধ্যে আবদুল হাকিম, শাহ গরিবুল্লাহ, গোলাম সফাতুল্লাহ, সাদেক আলী এবং ফকির মোহাম্মদ উল্লেখযোগ্য। সুপ্রাচীন প্রণয়কাহিনী অবলম্বন করে শাহ মুহম্মদ সগীর এর ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচিত হয়েছে। বাইবেল ও কুরআন এ নৈতিক উপাখ্যান হিসেবে সংক্ষেপে এই কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী (মৃত্যু ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) এবং সূফীকবি জামী (মৃত্যু ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) মূল কাহিনী অবলম্বন করে ইউসুফ-জোলেখা নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে তাদের কাব্যের সাথে শাহ মুহম্মদ সগীরের কাহিনীর খুব একটা সাদৃশ্য নেই। তবে ফেরদৌসীর কাব্যের রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিদ্যমান। ড. মুহম্মদ এনামুল হক অনুমান করেন, 'কুরআন ও ফেরদৌসীর কাব্য ব্যতিত মুসলিম কিংবদন্তিতে স্বীয়প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই শাহ মুহম্মদ সগীর তাহার ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচনা করেছিলেন'।' ইউসুফ-জোলেখা' মূলত ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনীর কাব্য কাব্যের আরম্ভে আল্লাহ ও রাসুলের বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজবন্দনা স্থান পেয়েছে। তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখার মিশরের অধিপতি আজিজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু জীবনের কোন এক পর্যায়ে ক্রীতদাস ইউসুফের অপরূপ রূপ দর্শনে তিনি তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্তু শত চেষ্টাও তিনি ইউসুফকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেন না। এরপর বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন। জুলেখা তখনও প্রেমাকাঙক্ষা পরিত্যাগ না করে ইউসুফের জন্য অপেক্ষা করে এবং পরে ইউসুফের মনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাদের মিলন হয়। কাব্যের এই প্রধান এই কাহিনীর সাথে আরও অসংখ্য উপকাহিনী স্থান পেয়েছে। এ ঘটনা মূলত কোরআন নির্দেশিত নয়। কোরাআনে বর্ণিত ঘটনাকে শতরূপে কল্পনার কোটি ডালপালা যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে। যার প্রধান অবলম্বন মূলত মৌখিক প্রচলিত কাহিনী। তবে সাহিত্য সত্য বা নীতিকে নয় শিল্পকে অনিবার্য মনে করে। শাহ মুহম্মদ সগীরের রচিত কাব্যটির অধিক জনপ্রিয়তার মূলেও রয়েছে তাঁর শিল্পীতবোধ ও নান্দনিক কলাকৌশল প্রয়োগ-সক্ষমতা। আরব ও ইরানিয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজ কল্পনা প্রসূত বিধুপ্রভা জুড়ে দিয়ে কাব্য রচনা করলেও ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই তিনি অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র কবির কল্পনা খেয়ালী মনের সপ্নারতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ছন্দ, সুষম ও সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গিতে কাব্যখানি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছে। ঝর্ণা ধারার ন্যায় শব্দসমূহ ভাষা নদীর বিস্তৃত বক্ষে মিশে গিয়েছে। চরিত্রসমূহ কল্পনায় মোড়ান হলেও মানব-মনের অতলরহস্যে স্পন্দিত ও উদ্বেলিত হয়েছে। ছন্দ শ্রবনেন্দ্রীয়কে আনন্দময় সুধায় ভিজিয়ে রাখে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং ছোট ছোট ঘটনায় বিভক্ত। অনুচ্ছেদশীর্ষে রাগ-তালের উল্লেখ রয়েছে। এতে বোঝা যায় কাব্যটি

গীতোপযোগী করে রচিত এবং এক সময় তা গীত হতো। কাব্যের ভাষা ও আঙ্গিক পরিচর্যার মাঝে নাগরিকতার ছাপ আছে। এক কথায় শাহ মুহম্মাদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জুলেখা' অনবদ্য এক সাহিত্য নিদর্শনের নাম, যার সুধা স্রোতে আজও তৃষ্ণার্ত কাব্যপ্রেমীগণ তৃপ্ত হতে পারেন। আব্দুল হাকিমের কাব্যখানিকে শব্দের একখানা বিশালাকার অভিধান বললে অতুক্তি হয় না। শব্দের চমৎকারিত্ব থাকলেও ভাষা নিষ্প্রাণ। মণি-মুক্তা থাকলেও বিন্যাস কলার অসামঞ্জস্যতার কারণে এ কাব্যটি নান্দনিক অলঙ্কাওে পরিণত হতে পারে নি। তবে একধরণের সরল সচ্ছতা রয়েছে। এর অপর কবি গরীবুল্লাহর অতিমাত্রায় 'যাবনী মিশাল' ভাষার প্রয়োগ করলে তা প্রাণহীন নয়। কবির সৌন্দর্য জ্ঞান থাকলেও দুর্বল বর্ণনরীতির কারণে তা শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ব্যার্থ হয়েছে।

লাইলী-মজনু : শিল্পগুণ সমৃদ্ধ জনপ্রিয় প্রণয়োপাখ্যান 'লায়লী-মজনু' দৌলত উজীর বাহরাম খান এর এক অমর কাব্য। দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত লায়লী-মজনু কাব্য রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে স্থান পেয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এর মতে, ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ সালের মধ্যে কবি লায়লী-মজনু কাব্য রচনা করেছিলেন। ড. আহমদ শরীফ ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ সালের মধ্যে কাব্যের রচনাকাল মনে করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে লায়লী-মজনু কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লায়লী-মজনু কাব্য পার্সিয়ান কবি জামীর লায়লী-মজনু নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। লায়লী-মজনু প্রেমকাহিনী সারা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এবং শিল্প সাহিত্যের নানা মাধ্যমে এই কাহিনী নিয়ে চমকপ্রদ সব কাজ হয়েছে। এই কাহিনীর মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। যদিও কাহিনীটিকে ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য বিবেচনা করা হয়। এখানে এক আমির পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে যায়। সে প্রেম তাকে এতোটাই বিভোর ও আত্মহারা করে ফেলে যে সবাই তাকে মজনু বা পাগল বলে সম্বোধন করতে থাকে। এক সময় লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু দুজনের মিলনে অজস্র বাঁধা এসে উপস্থিত হয়। এবং লায়লীর পিতা ও ভাই জোরপূর্বক লায়লীকে অন্যত্র বিয়ে দিলে কায়েস পাগল হয়ে বনে-জঙ্গলে দিশাহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অতি সুদর্শন ও আমিরের সাথে লায়লীর বিবাহ হলেও সে মন থেকে মহনুকে ভুলতে পাওে না। ফলে মৃত্যুকেই তারা মিলনের একমাত্র উপায় মনে করে তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটায় করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনী অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত। মধ্যযুগের সাহিত্যে এমন ট্রাজিকগুণ সমৃদ্ধ কাব্যের সংখ্যা ছিল বিরল। আহমদ শরীফ 'লায়লী-মজনু' কাব্যকে ছয়টি দূর্লভ গুণে অনন্য বলে দাবী করেছেন। তাঁর মতে 'লাইলী-মজনু' যথার্থ ট্রাজেডি' কাব্যকাহিনী অলৌকিকতা মুক্ত ও জীবনভিত্তিক। কাব্যরস অশ্লীলতামুক্ত, মানবিক প্রণয়োপাখ্যান, স্বাধীন অনুবাদ তথা মৌলিক রচনা এবং ঋতু পর্যায়ের গীতিনাট্যিক রূপায়ণ। কবি বজ্রবুলি ভাষাকে লাইলী-মজনুর প্রেমের বাহন করেছেন। এখানে কবির চিন্তাশক্তি জড়তামুক্ত, প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছ ও স্বাচ্ছন্দ, গতিশীল ও সাবলীল। পরিবেশ ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী সংলাপ রচনাতে কবি সিদ্ধহস্ত। তাঁর ভাষা ছিল আগাগোড়া অলংকারপূর্ণ। ভাষা ও শব্দশক্তির উপর তার অসামান্য ক্ষমতা কাব্যটিকে প্রাঞ্জল করেছে। এ সকল গুণের সমাবেশ লাইলী-মজনু কাব্যকে করেছে অসাধারণ ও জীবন্ত। তাই আজও এ কাব্য কিংবদন্তী রূপে অধিষ্ঠিত।

ডুবিল জীবন নৌকা ভাবের সাগরে।
প্রেমের কৃপান হানি বধিলা আক্ষারে॥

'লায়লী ও মজনুর প্রেম বিনিময়' খন্ড থেকে নেওয়া চরণদ্বয়ে লায়লীর মনে মজনুর প্রতি প্রেম সঞ্চায়িত হওয়ায় মজনুর মানসিক অবস্থার বর্ণিত হয়েছে। রূপ ও গুণে লায়লী ও মজনু অনন্য। তারা দুজনেই আমিরের সন্তান। শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে পাঠশালায় যায় উভয়ে। সেখানেই দেখা হয় লায়লীর সঙ্গে মজনুর। প্রথম দেখাতেই রূপমুগ্ধ দুজনা দুজনের প্রেমে পড়ে যায়। তাদের প্রেমের নৌকা ভালোবাসার সমুদ্রে ডুবে গেল। লায়লী ও মজনুর এই প্রেমাভাব ও আবেগকে কবি দারুণ উপমা-অলংকার ও চিত্রকল্প দ্বারা সজ্জিত করেছেন।

মম অন্তরে অতি রহিল সন্তাপ।
পিরীতি বলিতে মাত্র মনোদুঃখ লাভ॥

প্রেমের পরিণামে প্রাপ্ত অনন্ত অন্তরজ্বালার বিষয়টি দারুণ ভাবে উঠে এসছে এখানে। বিদ্যালয়ে প্রথম দেখায় কায়েস প্রেমে পড়ে লায়লীর। কিন্তু কোন ভাবেই সে লায়লীকে আপন করে পায়না। ফলে কায়েস লায়লীর জন্য পাগল প্রায় হয়ে যায়। সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বনেতে বাস করে। তখন লায়লীকে পাওয়াই তার জীবনের একমাত্র সাধনা হয়। আর আরাধনা ও

আর্তিও মূলেও থাকে এই চাওয়া। এই চাওয়ার জন্য তাকে সীমাহীন মূল্য দিতে হয়। নিদারুন দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। যা অনুভবে মজনুর খেদ জন্মে প্রেম তাকে কেবল মর্মব্যাথা দিল, অতন্দ্র নেশাভরা সুখ দিল না। এমনই এক না পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যে।

পদ্মাবতী: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি আলাওলের নাম খুব শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। তাঁর অমর কাব্য 'পদ্মাবতী' হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুসরণে রচিত। এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক প্রেমাখ্যান রূপে অমর হয়ে আছে। কাহিনী রূপায়ণ গুণ, চরিত্র চিত্রায়ণ নৈপূণ্য, প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব, শব্দ প্রয়োগ দক্ষতা ও অলঙ্কার বিন্যাসের চমৎকারিত্বে কাব্যটি কালিক গণ্ডি পেরিয়ে শত বছর পর আজও পাঠককে উদ্বেল ও অভিভূত করে চলেছে। এ কাব্য নির্মাণে আলাওল তাঁর সর্বোচ্চ কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে বাঙালির একটি বিশাল ও ব্যাপক কাব্য ঐতিহ্য। ক্রৌঞ্চ মিথুনকে দেখে বাল্মীকির মনে যেদিন কাব্যের উদয় হয় সেদিন থেকে এর পথ চল। রামায়ণ, মহাভারত, চর্যাপদ, ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে মধ্যযুগ ও পরবর্তী সময়ে। সেই ধারাকে ধাক্কা দিয়ে একটি নতুন পথের নির্মাণে 'পদ্মাবতী'র ভূমিকা অনন্য। আলাওল জায়সীর কাব্য অনুবাদ করেছেন। জায়সী এক একটি পূর্ণ স্তবকে চোপঈ দ্বারা সমস্ত কাব্যখানি লিখেছেন। চৌদ্দটি চরণের সাথে একটি দোহা যক্ত করে হিন্দী চোপাঈ রচিত হয়। আলাওল সেখানে বাংলা কাব্যের প্রচলিত পয়ার রীতিতে চরণ সাজিয়ে এবং স্তবকের স্পষ্ঠ ভেদরেখা না টেনে আখ্যানের আকারে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ পয়ার, একাবলী প্রভৃত খন্ড পয়ার লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী-চতুস্পদী পয়ার দ্বারা চরণ গঠন করেছেন। যেমন-

কাব্য কথা কমল সুগন্ধি ভরিপুর।
দুরেত নিকট ভাব নিকটেত দূর॥
নিকটেত দূর যেন পুষ্পেতে কন্টিকা।
দূরেত নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা॥ [সিংহল দ্বীপ বর্ণন খন্ড]

এছাড়া তার কাব্যে বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দও অনুসৃত হয়েছে এবং সেই সাথে যুক্ত হয়েছে, সঙ্গীতের তাল ও রাগিনী। অধিকাংশ অনুচ্ছেদ-শীর্ষে আলাওল ছন্দ রাগ-রাগিনীর উল্লেখ করেছেন। যা বাঙালির কাব্য ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেয়।

"শুকের বচন দ্বিজ কষ্ট মন,
কহিল ব্যাধের প্রতি॥
কেনে প্রাণীবধ করিস মগধ,
পরকালে কোন গতি ॥" [শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন] - রাগ চন্দ্রবলী ছন্দ

পদ্মাবতী কাব্যের স্থলে রয়েছে আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। এখানে তিনি মৌলিক আর এখানেই তিনি অনুসরণ করেছেন বাঙালির কাব্যে ঐতিহ্যকে, কাব্যের জগত তিনি অনুকার বা নবিশ ছিলেন না। তাঁর স্বচ্ছন্দ, বেগবান এবং অনায়াস প্রকাশক্ষম প্রতিভা ছিল। কাব্যের শুরুতে ব্যক্তি পরিচিত প্রসঙ্গে রচিত 'রাসাঙ্গ বর্ণনা', 'সংকীর্তি', মাগনের বর্ননা, 'আত্ম-পরিচয় এবং 'কাহিনী-সংক্ষেপ' অধ্যায়গুলিতে কবির নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

স্তুতি খণ্ড: প্রথমে প্রণাম কঁরু এক অবতার,
যেই প্রভু জীবদানে সৃজিলা সংসার॥

রোসাঙ্গ বর্ণনা: ছলিম শাহার বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগিরি হৈলরাজ্য পাল॥

সংকীর্তিমাগনের বর্ণনা: সুন্দর মগদ পাগ মস্তক ভূষিত,
নবঘন জিনি যেন চন্দ্রিমা উদিত॥

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ধারা অনুসরণ করে আলাওল নিজের আত্ম-পরিচয় দিতেও ভোলেন নি।।

মজলিসকুতুব তাহাত অধিপতি,
মুই হীন দীন তান অমাত্য সন্ততি॥ ...
সেই বলে রচিলু পুস্তক পদ্মাবতী,
নিজ বুদ্ধিবলে নাহি এবেক শকতি॥ [আত্ম-পরিচয়]

কাব্য শুধামাত্র আনন্দদানের সহায়ক নয়, নয় শুধু কল্পনার ফানুস উড়ান কথার ফুলঝুরি। সাহিত্যকে বলা যায় সমাজ দর্পণ, ভৌগোলিক পরিচয়ের উৎস। আলওলের পদ্মাবতী কাবে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতির জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছৈ। বাঙালি হিসেবে তিনি বাংলার শাশ^ ত প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ ও সাংস্কৃতিকে তাঁর কাব্যে ছেঁকে তুলেছেন। তাই পদ্মাবতীর চরিত্রগুলো হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতিজাত।

"ফলভাবে নম্র অতি আব্রু কাঠোয়াল,
বড়হর খিরিনী খাজুর আর তাল॥
গুয়া নারিকেল বেলডালিম্ব ছোলঙ্গ,
নারঙ্গ কমলা শ্যাম তারা কাউরঙ্গ॥" [সিংহল দ্বীপ বর্ণন খন্ড]

এই সকল ফলের সমাহারেই গড়ে উঠেছে বাংলার প্রাণ। যে প্রকৃতির মাঝে কবি বেড়ে উঠেছেন সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করে তিনি সাঁজিয়েছেন তাঁর কাব্যের দেহ। এছাড়া নাগরিক বৈদগ্ধ্য এবং শৈল্পিক পরিপাট্য তাঁর রচনার মৌলিক আকর্ষণ। তাঁর কাব্যে আবেগ নয় বুদ্ধি প্রাধান্য পেয়েছে। অশ্বচালনা বিদ্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভারতত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যায় কবির চিন্তাশক্তির প্রসারতা প্রশংসার দাবী রাখে। এই প্রজ্ঞা প্রকাশক্ষম শৈল্পিক ভাষা তাঁর বহু উক্তিকে প্রবাদে রুপান্তরিত করেছে।

"পড়শী হৈলে শত্রু গৃহে সুখ নাই,
নৃপতি হৈলে ক্রোধ দেশেত নাই ঠাঁই॥
সেই ঘরে আছয়ে মার্জার কালরূপ,
পক্ষীর নিয়স মৃত্যু জানিও স্বরুপ॥" [পদ্মাবতীর জন্ম-বর্ণন খন্ড]

ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কন ইত্যাদি কবিদের কাব্যের ন্যায় আলওলের কাব্যেও রয়েছে কিছুটা ইতিহাসের ছায়াপাত। যদিও তা কবির উপলক্ষ নয়। তিনি রোমান্টিক প্রেমকে উপজীব্য করে কাব্য রচনা করলেও রোমান্স আবহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অভিযান, মরমিয়াবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে স্থান দিয়েছেন। ঐতিহাসিক বিষয়কে ঘিরে রেখেছে অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় সব বিষয়। যা রোমন্সরতকে ঘনীভূত করবার সহায়ক হয়ে উঠেছে। বাঙালির নিস্তরঙ্গ জীবনে আডভেঞ্চারের আমেজ এনে দেয়।

"মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান,
তথাত জালালপুর পূর্ণবন্ত স্থান॥
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলামা,
কথেক কহিমু সেই দেশের মহিমা॥ [পদ্মাবত-জন্ম- বর্ণন খন্ড]

'পদ্মাবতী' আধ্যাত্মিক সাধনতত্ত্বের অমর কাব্য। প্রতীক ও রূপকের আশ্রয় নিয়ে মূলত কবি সুফি প্রেম দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। আধ্যাতিকতার অদৃশ্য এক অনুভূতিতে মোড়া এ কাব্যে বিশুদ্ধ প্রেমের কথা বলা আছে। জীবাত্মা কিংবা পরমাত্মা-উভয়কে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে হলে পাপশূণ্য চাতুরীহীন শুদ্ধ আরাধনা প্রয়োজন। লৌকিক মানবের প্রেমের আড়ালে অলৌকিক প্রেম প্রকাশের সূক্ষ চেষ্টায় কবি দারুণ সফলতা দেখিয়েছেন।

"তার মাঝে প্রেমকতা মাধুর্য অপার,
প্রেমভাব সংসার সৃজিলা করতার॥
প্রেম বিনু ভাব নাহি ভাব বিনু রস,
ত্রিভুবনে যতদেখ প্রেম হন্তেবস॥"

তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রণয় কাব্যসমূহ সৃজনের মূলে উচ্চশ্রেণীর মানুষের মনরঞ্জনই প্রধান ছিল। ব্যবহারিক জীবনের নিত্যতার উর্ধ্বে রসোপলব্ধির অনিত্য বাসনা ও নন্দনপ্রীতির শাশ^ ত আকাঙ্ক্ষা এখানে ব্যক্সময় রূপ লাভ করেছে। সুফী তত্ত্ব প্রকাশ পেলেও প্রেম ও সৌন্দর্য সৃষ্টিই 'পদ্মাবতী' সৃজনের প্রধান লক্ষ । সেকারণে এখানে মানবোচিত আচরণ, সুখ-দুঃখের দোলাচল ও ইন্দ্রিয়জ চাহিদার খোলামেলা প্রকাশ আছে, আছে শৃঙ্গার শাস্ত্রের বিশদ বিবরণ। তবে তা কোথাও মাত্রা অতিক্রম করে সাহিত্যের মর্যাদা হানি করেনি। যথাযথ স্থানে যথার্থ বিষয় অবতারণায় আলাওলের তুলনা বিরল। রত্নসেন পদ্মাবতীর বিবাহের বিচিত্র বর্ণনায় আলাওল একদিকে কাব্যের আবেগকে সঠিক দিশা দেওয়ার সাথে সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতারও নিখুঁত সমন্বয় করেছেন। কন্যাসজ্জা, কন্যা-সম্পাদান, বাসরসজ্জা,বঙ্গকৌতুক গীতবিবাদ, বিবিধ স্ত্রী-আচার ইস্যাদি বর্ণনায় সমকালীন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিকে অনুসরণ করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের সর্ব প্রকার সংবাদ প্রকাশে সহায়তা করতো শুক। সেই সাথে গম্ভীর তত্ত্বপ্রচারণার কাজও তার মাধ্যমে চালিয়ে দিত।

যার প্রমাণ 'পদ্মাবতী' কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। তবে এ কাব্যেও বিশিষ্টতা হলো এখানে কবি কোন নিদৃষ্ট মত ও পথের কথা প্রচার না করে অভিজ্ঞতার অগ্নিতে স্নাত হয়ে অনুভূত উপরব্ধির কথা প্রকাশ করেছেন শুকের মুখ দিয়ে । যেমন-

পত্নি হইয়া কেহ গর্ব না করিও
আপনাকে সব হৈতে হীন আকলিও।
পন্ডিত হইয়া গর্ব করে যেই জন,
তার ফল দেখ এই শুকের বন্ধন।

ফলে আলাওলের কাব্য অনুবাদ হলেও তা অনেকাংশেই মৌলিক। জয়সীর পদ্মাবতী মূলতঃ অধ্যত্মরসের কাব্য। আলাওলের পদ্মাবতী সেখানে মানবরসের কাব্য। জয়সী মিস্টিক ভাবনা লালিত চিন্তা দ্বারা তাঁর কাব্য গড়ে তুললেও আলাওল হিউম্যানিষ্ট বোধকে অধিক প্রাধান্য দান করেছেন। এককথায় জায়সীর আধ্যাত্মিক চিন্তার সাথে তিনি মানবিক চিন্তার মধুর মিশ্রন ঘটিয়েছেন। আলাওল বুদ্ধিবাদী কবি ছিলেন। কবির প্রতিটি বানী এবং কাব্যরীতিতে পান্ডিত্যের ছাপ আছে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন- "তাঁহার রচনায় প্রাকৃতপৈঙ্গল, যোগশাস্ত্র, তসউফ, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, অশ^ চালানবিদ্যা প্রভৃতি নানা বৈচিত্র ব্যাপারে উল্লেখ দেখা যায়। বাস্তবিক তাঁহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পন্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিল না।''

"গুরু শুক আমাত কহিছে যোগমর্ম,
এক যোগগে ভাবভক্তি আর যোগে কর্ম॥
কর্মযোগ হৈলে পুনি কায়া সিদ্ধি পাত্র,
ভাবভক্তি যোগমুক্তি বঞ্চিত পুরাএ॥" [প্রেম খন্ড]

এর পাশাপাশি বিভিন্ন রাগ ও তালে গান রচনা করে আলাওল নিজের সৃজনশীল প্রতিভারও পরিচয় দিয়েছেন। পদ্মাবতী কাব্যে তিনি লাচারী, কেদার, গান্ধার, চন্দ্রাবলী, লাচারী ভাটিয়ালি, শ্রীগান্ধার, ধানসী, মালসী ইত্যাদি রাগরাগিনী ও তালের নাম উল্লেখ করেছেন। বাংলা কাব্যে সঙ্গীতের এত প্রাচুর্য দেখা যায়না। তবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনন্যতার সাথে সাথে আলাওলের মাঝে ছিল শৈল্পিক সংযম। যার ফলে তাঁর কাব্য পান্ডিত্যের ভারে অবনত না হয়ে সমুন্নত হয়েছে।

চরিত্র নির্মাণে আলাওল দেখিয়েছে তাঁর ক্ষমতা। তিনি চিরন্তন প্রেমিক-প্রেমিকার বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন-পদ্মাবতী রত্নসেনের চরিত্র দ্বারা। সেই সাথে স্বামী পরিত্যক্ত নারীর সীমাহীন বেদনার প্রকাশ দেখিয়েছেন নাগমতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অকুণ্ঠ ভালবাসার চিত্র আলাওল দেখিয়েছেন গন্ধর্বসেন ও চম্পাবতী চরিত্র চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে। পদ্মাবতী কাব্যে 'শুক' একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র বিশেষ। 'শুক' অধ্যাত্মতত্ত্বের দিক থেকে বাংলা কাব্যে গুরুর ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুতঃ শুক বিবেকবান আত্মার প্রতীক। আলাওল এভাবেই শুককে উপস্থাপন করেছেন।

প্রেম ও সৌন্দর্য সৃষ্টি আলাওলের প্রতিভার বড় সাক্ষর। আলাওল মূলের অলৌকিক প্রেমে মানবিক আবেগ অনুভূতির সঞ্চার করেছেন। আলওলের প্রকাশ ভঙ্গি ব্যঞ্জনানির্ভর নয়, বাচ্যার্থনির্ভর। এজন্য তাঁর কাব্যে স্পষ্টতা আছে, বস্তুধর্ম আছে, ঘটনা ও চরিত্র গুলোকে তিনি দেশ-কাল পাত্রের আবষ্টনে সজীব ও স্বাভাবিক করতে পেরেছেন। আলাওল খুঁটিনাটি ব্যাপারে সামাজিকতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। পদ্মাবতীর বিবাহ, বাসর মিলন, শুভ দিন নির্ণয়, পোশাক-পরিচ্ছেদ, গৃহসজ্জা, স্ত্রী-আচার, মন্ত্রপাঠ মাল্যবদল, কন্যা যৌতুক প্রদান, আহার-বিহার প্রভৃতি বিষয় বর্ণনায় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। যা একান্ত বাংলার।

তোমার বিচ্ছেদে মোর নারহিবে প্রান
নিজ হস্তে মারি মোরে দেও মৃত্যু দান॥
কিবা আমা সঙ্গে লও হৈয়া যাম দাসী,
পতি যোগী নারী অনুচিত গৃহবাসী॥

ভাষা, অলংকার ও ছন্দে তিনি অভূতপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পদ্মাবতী কাব্যে ভাষার গাঁথুনি বজ্রের বন্ধনে আঁটা। তাঁর ভাষা জ্ঞানীর । সে ভাষার শক্তিময় দেহে কবি প্রচুর পরিমাণে অলংকার পরিয়েছেন। আর অক্ষর বৃত্ত পয়ার ছন্দ ব্যবহার করে ভাষায় দিয়েছেন সাঙ্গিতীক মাধুর্য। পদ্মাবতী'তে উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি অলংকার এসেছে কথায় কথায়। উপমা প্রয়োগে কবির খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যকে তুলে ধরতে পেরেছেন, ভাবনার কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেনি। পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনায় তিনি যে উপমার ব্যবহার করেছেন তা অনুসরণ যোগ্য-

আপদ লম্বিত কেশ কস্তরি সৌরভ,

মহা অন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব॥
অলিপিক ভুজঙ্গ চামর জলধর,
শ্যামতা সৌষ্ঠব কেহ নতে সমসর॥ [পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা খন্ড]

মধুমালতীঃ হিন্দি কবি মনঝনের মধুমালত্ বা সাধনের মৈনাসত্ কাব্যের অনুসরণে মুহম্মদ কবীর 'মধুমালতী' কাব্য অনুবাদ করেন। এর কাহিনী উৎস ভারতীয় উপাখ্যান। এতে কবি কিছু অলৌকিক, কিছু আধ্যাত্মিক, কিছু বাস্তব উপাদানের সমন্বয় ঘটিয়ে রাজপুত্র মনোহরের সাথে রাজকন্যা মধুমালতীর প্রেমকথা প্রকাশ করেছেন। কাব্যটির ভাষাসৌকর্য সাধনে কবি উত্তীর্ণ। মধুর ধ্বনি, সংস্কৃত প্রভাবপুষ্ট বিশুদ্ধ বাংলা, ছন্দ ও অলংকার সুশোভিত হয়ে মধুমালতী কাব্য হয়েছে রূপরস সমৃদ্ধ। রাজপুত্র মনোহর ও রাজকন্যা মধুমালতীর রূপকথাসুলভ রোম্যান্টিক প্রেম এতে বর্ণিত হয়েছে। মূল কাব্য অধ্যাত্ম রসাত্মক হলেও অনুবাদে তা আদি রসাত্মক কাব্যে পরিণত হয়েছে। কাব্যটি তৎকালে এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, কবিরের পরবর্তী আরও ছয়জন কবি একই নামে কাব্য রচনা করেন। তবে একমাত্র সৈয়দ হামজা ব্যতীত অন্য কারও কাব্য ততটা শিল্পসফল হয়নি।

"রূপে গুণে কুলেশীলে চন্দ্রিমা সমান
এ কন্যা মানবী হএ অপ্সরা জন।।
পূর্ণ-শশী নিন্দে মুখে নিন্দে অরবিন্দ
চক্ষে ধরে জুতি সে রূপের চন্দ।।"

বিদ্যাসুন্দর: রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি হিসাবে শাহ বারিদ খান কালিকামঙ্গল কাব্যধারার বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অন্যতম রূপকার। সাবিরিদ খানের কাব্যের কাহিনীর সাথে দেবী কালিকার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। কাব্যরস সৃষ্টি ব্যতীত এর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কবি রোমান্স হিসেবেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর কাব্য কে নাটগীত বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যেও মাঝে প্রেমময় মানবীয় রস প্রধান্য পেয়েছে। ড. আহম্মদ শরীফ বলেছেন- ভাষা, উপমা, অলংকারের সংযত ব্যাবহারে আর পদ লালিত্যে, ছন্দ সৌন্দর্য্যে বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।'' বিদ্যাসুন্দর কাব্যে গীতধর্মীতা ও নাটকীয়তার অপূর্ব সমনন্বয় ঘটেছে। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনী এর উপজীব্য। কাব্যটির উৎস এগারো শতকের সংস্কৃত কবি বিলহনের চৌরপঞ্চাশিকা। রূপবান ও গুণবান রাজকুমার সুন্দর কালিকাদেবীকে আরাধনায় তুষ্ট করে সুন্দরী বিদুষী রাজকন্যা বিদ্যার পাণিলাভের বর পায়। পরে দেবীপ্রদত্ত শুকপাখি নিয়ে সুন্দর বিদ্যার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হয়। রাজপ্রাসাদের মালিনীর মাধ্যমে চিত্র ও প্রণয়লিপি প্রেরণ করে সুন্দর বিদ্যাকে আকৃষ্ট করে এবং তাদের প্রণয় ঘটে। পরে সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার শয়নগৃহে প্রবেশ করে এবং তাদের মিলন হয়। ক্রমে বিদ্যার শরীরে অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ ফুটে উঠলে রাজা ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর আদেশে সুন্দরকে শূলদন্ড প্রদান করা হয়। সুন্দর তখন স্তবদ্বারা দেবীকে পুনরায় তুষ্ট করে প্রাণে রক্ষা পায় এবং বিদ্যাকে লাভ করে। বিদ্যা ও সুন্দরের এই প্রেমকাহিনী অবলম্বনে প্রথমে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন ষোলো শতকের কবি শাহ বিরিদ খান ও দ্বিজ শ্রীধর। পরে কৃষ্ণরাম, বলরাম, কবিশেখর, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় প্রমুখ এ ধারায় কাব্য রচনা করে যশস্বী হন। তবে এঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বা কালিকামঙ্গলই শ্রেষ্ঠ কাব্য। প্রেমের প্রগাঢ় উপলব্ধি এখানে সম্পূর্ণরূপে দেহ কেন্দ্রিক। প্রণয় কাব্যগুলোতে সাধারণত প্রেমের সুত্রে দেহ সম্ভোগের বিষয়টি এসেছে। কিন্তু এ কাব্যে তা স্বাভাবিক মাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তবে রসঘন করে আদিরস পরিবেশনে কবির কৃতিত্ব সীমাহীন। ভাষা অনেকাংশে সরল ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। উপমা- অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে চারপাশের পরিচিত বিষয়কে অবলম্বন করলেও সেখানে কবির সমৃদ্ধ শৈল্পিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাধিরাজদের কাহিনী হলেও অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশে কবি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত বোধকে অধিক মূল্যায়ণ করেছেন। মুসলিম কবি হয়েও সাবিরিদ খানের চিন্তা ঐতিহ্যিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাষা কাঠামোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান: 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' কাব্যের কবি দোনাগাজী। আনুমানিক ১৬ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৭ শতকের প্রথমভাগের কবি তিনি। তিনি তাঁর কোন কাব্য বা পুঁথিতে নিজের আত্মপরিচয় সংযুক্ত করে যাননি। যার ফলে সঠিক সময় নির্ধারণ করা কিছুটা দুরূহ হয়ে পড়ে। তবে গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দোনাগাজীর আবির্ভাব। কবির জন্মস্থান নিয়েও মতভেদ রয়েছে। তবে তিনি তাঁর কাব্যের একটি স্থানে বলেছেন, 'দোল্লাই' দেশে তার নিবাস। দোল্লাই পরগনা বর্তমান কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। দোনাগাজীর 'চৌধুরী' উপাধি এবং কাব্যে কবির কবি-প্রতিভার চমৎকৃতি দেখে আহমদ শরীফ অনুমান করেছেন, 'তিনি ধনী-মানী বংশের সন্তান। দেশ প্রচলিত বিদ্যা ও

সংস্কৃতিতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন।' দোনাগাজী রচিত 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামান' কাব্যের শুরুর স্তুতিপর্বে আল্লাহ-রসুল-পীরের বন্দনা রয়েছে কিন্তু মধ্যযুগের প্রচলিত নিয়মে সেখানে কোন রাজা, আমাত্য বা অন্য কারও প্রশংসা করা হয়নি। বিষয়টি প্রমাণ করে যে, তিনি কারো পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে কাব্য রচনা করেননি। যথেষ্ট ধনী হবার ফলে হয়তো তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে নি। অন্যদিকে এ বিষয়টি তাঁর সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগকেও প্রতিষ্ঠিত করে। দোনা গাজী চৌধুরীর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' কাব্যের আদি উৎস 'আলেফ লায়লা'। আরব্য উপন্যাসের এই বিস্তৃত বক্ষে সহস্র কাহিনী ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। মৌখিক ভাবে প্রচলিত এ কাহিনীসমূহ নানা ডালপালা ছড়িয়ে গোটা পৃথিবীকে এর মায়াজালে আবদ্ধ করেছে। বাংলা কাব্যেও বুকেও সেই কাহিনী বেশ বড় একটা স্থান দখল করে নেয়। দোনা গাজী চৌধুরীর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' তারই প্রমাণ বহন করে। প্রেমকে এখানে বড় করে দেখান হয়েছে। এবং প্রেমে সফল হবার জন্য নানা অলৌকিক ও অতিলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটান হয়েছে। যা মানুষের কল্পনা ও স্বপ্নকেও অভিভূত করে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিরতিহীন অলৌকিক আবহ মাঝে মাঝে কাব্যের গতিকে দুর্বল করেছে। প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য দুর্বার প্রচেষ্টা কাহিনীকে করেছে শিথিল ফলে গল্পের রস হয়ে পড়েছে তরল। রোমন্সরসের আবহ ঘনীভূত করবার তাগিদ হতে কবি আদিরসাত্মক বিষয়সমূহকে অধিক মাত্রায় পরিবেশন করেছন। অনেকখানে তা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। দেহসর্বস্ব এ প্রেমে কেবল 'প্রকৃতি' আছে 'আর্ট' নেই। তবে সংযমের সুষ্ঠতা থাকলে দেহজ প্রেম এখানে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হত। দোনা গাজী চৌধুরী ছাড়াও আলাওল, ইব্রাহিম ও মালে মুহম্মদ এই প্রেমকাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন।

সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী: সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের রচয়িতা দৌলত কাজী ছিলেন মধ্যযুগের একজন বাঙালি কবি। তিনি ১৭শ শতাব্দীর শুরুর দিকে চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে সুলতানপুরের কাজী পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখার ভাষা ছিলো বাংলা। তিনি 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করে বাংলার শক্তিমান কবিদের মাঝে নিজের অবস্থান পোক্ত করেছেন।। বাংলা কাব্যে তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রণয়কাহিনীর পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। দৌলত কাজী অল্প বয়সে নানাশাস্ত্রে সুপন্ডিত হয়ে উঠেন। কিন্তু নিজ দেশে কাজের স্বীকৃতি না পেয়ে তিনি ভাগ্য অন্বেষনের জন্য আরকানে যান। সে সময় সাধারণত চট্টগ্রামবাসী জীবিকা অর্জনের জন্য আরাকানে যেতেন। আরাকান রাজসভায় তখন বহু কবি এবং জ্ঞানী লোকের ভিড় ছিল। সে ভীড়ে দৌলত কাজীও যোগ দেন এবং একদিন এক মাহেন্দ্র ক্ষণে তিনি তাঁর প্রতিভার পূর্ণ স্বীকৃত লাভে সফল হন। রাজার প্রধান উজির আশরাফ খান একদিন হিন্দি ভাষার কবি মিয়া সাধন রচিত 'সতী ময়না' কাহিনী শুনতে চান। দৌলত কাজী পাঞ্চালীর ছন্দে সতী ময়নার কাহিনী বর্ণনা করেন। যা আশরাফ খান সহ সকলের প্রশংসা অর্জন করেন এবং আরাকান (রোসাঙ্গ) রাজ দরবারে কবিদের সভার মধ্যে গৃহীত হন এবং সেখানে মর্যাদা লাভ করেন। এবং আশরাফ খান তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৬২২ হতে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আশরাফ খান আরাকানের তৎকালীন অধিপতি থিরিথু ধম্মা বা শ্রী সুধর্মার নস্কর উজির বা সমর সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দৌলত কাজী ও আশরাফ খান, দুই জনেই সুফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দৌলত কাজী কাব্যের শুরুতে থিরিথু ধম্মা এবং আশরাফ খানের প্রশংসা করে লিখেছেন-

"কর্নফুলী নদী পূর্বে আছে এক পূরী
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে যুদ্ধাচার
নাম শ্রী থুধম্মা রাজা ধন অবতার।।
মুখ্য পাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান
হানাফী মোজাহাব ধরে চিস্তিয়া খান্দান।।
শ্রীযুক্ত আশরাফ খান লস্কর উজীর
যাহার প্রতাপ বজ্রে চুর্ণ আর শির।।"

মিয়া সাধন নামক হিন্দি ভাষী মুসলিম কবি রচিত 'মৈনাসত' নামক কাব্যই ছিল কবি দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনার আদর্শ। এই কাব্যের সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ সালের মধ্যে এই কাব্য রচনা করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মহাকাব্য সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরন করেন। কবির মৃত্যুর ২০ বছর পরে ১৬৫৯ সালে কবি আলাওল (আনুমানিক ১৫৯৭-১৬৭৩) কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন। তিন খন্ডের এই কাব্যের প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ডে দৌলত কাজী কবি প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখে গেছেন। প্রথম খন্ডে কাব্যের নায়ক নায়িকা এবং তাদের স্বভাবগত দোষগুণের কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে কাব্যের নায়িকা ময়নাবতী বিরহের আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ

হয়েছে। তৃতীয় খন্ডে ময়নাবতীর বিরহের অবসান হয় এবং তার স্বামী লোর ও সতিন চন্দ্রানীর মিলন হলো। দ্বিতীয় খন্ড লেখার পর কবির মৃত্যু হয় এবং কবির ইঙ্গিত অনুযায়ী কাব্যটিকে মিলনাত্মক করে কবি আলাওল দৌলত কাজীর এ অসমাপ্ত কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে যে অনন্য নিদর্শন রেখে গেছেন তাঁর মূল্য মহাকবি আলাওলের রচনার পাশে খুব সহজেই স্বীকৃত। কবি আলাওল অসম্পূর্ণ কাব্য সমাপ্ত করতে গিয়ে কবি দৌলত কাজীর প্রতি সম্মান নিবেদন করে লিখেছেন "তান সম আমার না হয় পদগাঁথা"। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবুলি ভাষায় ও তার বিশেষ দখল ছিল। তিনিই একমাত্র বাংলা ভাষার কবি, যিনি তার রচনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন দেব-দেবীকেন্দ্রিক কাহিনী উপজীব্য না করেও ব্রজবুলি ভাষার সার্থক ব্যবহার করা সম্ভব। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহিত্য বিশারদ বলেন, "দৌলত কাজীও আলাওলের ন্যায় হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। সমালোচ্য গ্রন্থে দৌলত কাজী শুদ্ধ সংস্কৃতে কয়েকটি গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে রচনা অতি কোমল ও মধুর। বঙ্গ ভাষায় যে তাঁহার অধিকার অসাধারন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রজবুলীতে তাঁহার অধিকার আরো বেশি ছিল বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক দৌলত কাজী ও আলাওল সর্বদা মুসলমান সমাজে অতুলনীয়। অধিকন্তু তাঁহারা যে বঙ্গীয় সাহিত্য দরবারে হিন্দু-কবিগনের সহিত একাসনে বসিবার সম্পূর্ন উপযুক্ত আশা করি। সে বিষয়ে কেহ ভিন্নমত হইবেন না। দৌলত কাজী আলাওল সাহেবের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের লোক। সুতরাং তাঁহাদের ভাষার মধ্যে যে একটু পার্থক্য আছে তাহা বিচিত্র নহে। আমাদের মতে মুসলমানদের এই দুই মহাকবি প্রায় সমতুল্য। দৌলত কাজী বিদ্যাবুদ্ধিতে বা কবিত্বে আলাওল সাহেব অপেক্ষা কোন অংশেই হীন বলিয়া বোধ হয় না। আলাওল নিজেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আলাওলের মত কবি তদপেক্ষা কোন কম ক্ষমতাশীল কবির অসমাপ্ত কাব্যের সমাপ্তি বিধান করিতে কদাপি যাইতনা, ইহাত সহজেই বলা যায়। ফলত সর্বসাধারণের নিকট সুকবি বলিয়া মান্য হইবার যদি কোন কবি মুসলমানদের থাকে, তবে সেই কবি দৌলত কাজী ও আলাওল সাহেবই। ইহারা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বহুভাগ্যেই কোন সমাজে এমন লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে'। ড. এনামুল হকও প্রায় একই বিষয়ের অবতারণা করে বলেন, "দৌলত কাজী শুধু বাঙ্গালি মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের মধ্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার কবি শক্তি অসাধারণ। তাঁহার শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ তীক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী, বাংলা ও ব্রজবুলী এই উভয়বিধ ভাষায় তাঁহার ক্ষমতা তুলনাবিহীন'। উভয়ের সাথে একমত হয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন, "বাংলার হিন্দী-কারমী রোমান্টিক কাব্যধারার ভাগীরথ হচ্ছে রোসাঙ্গ-দরবারের দুজন সভা-কবি দৌলত কাজী ও আলাওল।" আর এ দুজন কবির পরিশ্রমে লেখা প্রণয়কাব্য 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'। কাব্যটি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ একটি প্রণয়োপাখ্যাণ। অলৌকিকতার ছাঁয়া থাকলেও তা কাব্যসৌর্যকে ব্যাহত করেনি। তবে মর্তের সাধারণের মানুষের মনাবিক প্রণয় আকাঙ্ক্ষা এখানে নান্দনিক রূপ লাভ করেছে। এ কাব্য পাঠে পাঠক নিজের মন ও মননের সাথে চরিত্রসমূহের মিল খুঁজে পান। কবির বর্ণনক্ষম প্রজ্ঞার অনন্য নজির দেখা যায় এ কাব্যে। সরলতার সহিত পান্ডিত্যের অপূর্ব মিশেলে কাব্যখানা বেশ সুখপাঠ্য। ছন্দের লালিত্যময় ঝংকার কর্ণকুহরে অলৌকিক এক বোধের সঞ্চার করে।

চন্দ্রাবতী: কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৭শ শতক) আরাকানের মধ্যযুগীয় বাংলা কবি। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার চক্রশালা। মাগন ঠাকুরের পিতা বড়াই ঠাকুর ছিলেন আরাকানের একজন মন্ত্রী। আরাকানের রাজা নরপিতজ্ঞি (১৬৩৮-১৬৪৫) বৃদ্ধ বয়সে তার একমাত্র কন্যার অভিভাকত্বের ভার মাগন ঠাকুরের উপর ন্যাস্ত করেন। রাজা নরপিতজ্ঞির মৃত্যুর পর রাজকন্যা থাদোমিন্তা মুখ্য পাটেশ্বরী হলে মাগন ঠাকুর মুখ্যপাত্রের (প্রধানমন্ত্রী) পদমর্যাদা লাভ করেন। তিনি বাংলা, ফারসি, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষায় মাগন ঠাকুরের অগাধ পান্ডিত্য ছিল। সঙ্গীত ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও তাঁর দখল ছিল। রোসাঙ্গের কবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে পদ্মাবতী (১৬৫২) ও সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৯) কাব্য রচনা করেন। মাগন ঠাকুর গুণীর সমাদর করতেন এবং তিনি নিজেও ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। তাঁর রচিত চন্দ্রাবতী কাব্যের একটিমাত্র পুথি পাওয়া গেছে। এটি লোককাহিনী আশ্রিত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। কাব্যটি খুব একটা শিল্পসফলতা অর্জন করেনি। তবে বর্ণনাধর্মী এ কাব্যে সাহিত্যিক গুণের অভাব থাকলেও মধ্যযুগের কাব্য হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কোরেশী মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী'র অবিনবত্ব ও অনন্যতা খুব একটা দেখা যায় না। আলাওল সহ মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের কাব্যেও সরল অনুকরণ দেখা যায়। অলৌকিকতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার কারণে কাব্যরস ব্যহত হয়েছে। এবং ভাষার আড়ষ্ঠতা ও অলংকার বাহুল্য শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বাঁধা প্রদান করেছে। সেই সাথে শাস্ত্রীয় জ্ঞান পরিবেশনের চেষ্টা পাঠকের মনোকষ্টের কারণ হয়ে ওঠেছে। কাব্যিক চাতুর্য ও নাটকীয় গতি তৎপরতা না থাকায় বর্ণনা অনেকস্থলেই দীপ্তিহীন হয়ে পড়েছে। চরিত্র চিত্রায়ণে তিনি কেবল পূবর্তনের অনুকরণ করেছেন। লৌকিক কিংবা

অলৌকিক গুণের সমাবেশে করে কাব্যকে তিনি পূর্ণমাত্রায় রসঘন করতে অসফল হয়েছেন। তবে সকল ব্যর্থতা সত্ত্বে কাব্যখানির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

গুলে-বকাওলী: নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাওলী' মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারার এক অনন্য সংযোজন। সতেরো শতকে তিনি প্রথম গুলে বকাওলী কাব্য রচনা করেন। রাজপুত্র তাজুলমুলকের সঙ্গে পরীকন্যা বকাওলীর প্রেম নিয়ে এর আখ্যান নির্মিত। কাহিনীতে দুঃসাহসিক অভিযাত্রাসহ নানা অলৌকিক ঘটনা আছে। মধ্য ভারত এ কাহিনীর উৎসভূমি। সেখানে 'বকাওলী' নামে এক প্রকার ফুল পাওয়া যায়। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উর্দুতে রচিত একখানি গুলে বকাওলী কাব্য স্প্রিংগারের ক্যাটালগে উল্লিখিত হয়েছে। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে শেখ ইজ্জতুল্লাহ তাজুলমুলক গুলে বকাওলী নামে একখানি গ্রন্থ ফারসি গদ্যে রচনা করেন। তিনি ছিলেন বাঙালি। নওয়াজিস খান ঠিক কোন গ্রন্থ অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনা করেন তা জানা যায় না। নওয়াজিস খানের পরে অনেকেই পদ্যে ও গদ্যে গুলে বকাওলী রচনা করেছেন। পদ্যে মুহম্মদ মুকিম (১৭৬০-৭০), মুহম্মদ আলী, মুন্সি এবাদত আলী (১৮৪০), উমাচরণ মিত্র (১৮৪৩), আব্দুস শুকুর এবং গদ্যে বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৪) গুলে বকাওলী রচনা করেছেন। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৮ সালে একটি নাটক রচনা করেন। এবাদত আলীর কাব্য দোভাষী পুথি জাতীয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-এর উদ্যোগে এ কাহিনী অবলম্বনে মুন্সি নেহালচাঁদ লাহোরি উর্দু গদ্যে মজহাবে ইশক (১৮০৩) এবং দয়াশঙ্কর নসিম পদ্যে মসনবি গুলজারে নসিম (১৮৩৫) রচনা করেন। রোমান্সমূলক প্রেমকাহিনী হিসেবে গুলে বকাওলী যে তখন খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলু এসব দৃষ্টান্তে তা প্রমাণিত হয়। নওয়াজিস খানের ওলে বকাওলী কাব্যগুণে উত্তম। এ কাব্যেও মাঝে আত্মপরিচয়, রাজপ্রশস্তি ও ভণিতা থেকে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হলো: চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার আমিরাবাদ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোহাম্মদ এয়ার খন্দকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আমিরাবাদ গ্রামের পত্তন করেন। কবির প্রপিতামহ ছিলিম খান (সেলিম খান) গৌড় থেকে প্রথমে চট্টগ্রামে এসে 'ছিলিমপুরে' বসতি স্থাপন করেন। মাওলানা আতাউল্লাহ ছিলেন কবির পীর। কবি স্থানীয় জমিদার বৈদ্যনাথ রায়ের নিকট থেকে গুলে বকাওলী রচনার প্রেরণা লাভ করেন। চট্টগ্রামের দোহাজারির জমিদার জোরওয়ার সিংহের প্রশংসা করে জোরওয়ার সিংহ কীর্তি রচিত হয়। অপর জমিদার হোসেন খানের স্তুতি করে রচিত হয় পাঠান প্রশংসা। এগুলি ফারসি ক্বাসিদার আদর্শে রচিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। রোম্যান্টিক প্রণয়কাব্য গুলে বকাওলী কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। এর কাহিনীর উৎস ভারতবর্ষ। নওয়াজিস খানের বর্ণনা সরস ও কবিত্বময়। একারণে তা বাংলার পাঠকের নিকট খুবই জনপ্রিয়তা অজূন করে। রোমাঞ্চধর্মী এ প্রণয়োপাখ্যানে কবির কবিত্বশক্তির ছাপ বিদ্যমান। এ কাব্যে বাস্তবের অংশ কম, অলৌকিক বিষয়ের অবতরণা অকিমাত্রায় আছে। তবে সে মাত্রা কাব্যকে গতিহীন না করে স্বপ্নময় করে গড়ে তুলেছে। কবির লেখনীর স্বচ্ছন্দতা কাব্যটিকে সাবলীল মাধুর্য দান করেছে। ভাষা ও অলংকার নির্মাণ কবির দক্ষতা তাঁর শিল্পকমর্কে গতিদান করেছে; এক চঞ্চল বেগ সংযুক্ত করেছে। রূপ বর্ণনা, মেয়েলী সাজসজ্জার খুঁটিনাটি বিষয় উপস্থাপনে এবং প্রেম মিলনের আনন্দঘন মুহূর্ত চিত্রায়িত করতে তাঁর মুন্সীয়ানার চিহ্ন ফুঠে উঠেছে সর্বত্র।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রোমান্টি প্রণয়োপাখ্যানসমূহ। দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্যধারার মাঝে মানবিক বোধের উজ্জ্বনী সুধা ঢেলে দিয়ে রচিত এ কাব্যসমূহ কাব্যপিপাসুদের গভীর মনোযোগ ও অনুরাগে সিক্ত হয়।। ধর্মীয় ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির পালাবদল সাহিত্যে যে নতুন উন্মাদনা সঞ্চার করে, তারই প্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে রোমান্টি প্রণয়কাব্যসমূহের অতল বক্ষে। জীবন সম্পৃক্ত বোধ এখানে নব মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেই সাথে প্রেম ও সৌন্দর্যের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতেও কাব্যসমূহের জুড়ি মেলা ভার। আধ্যাত্মবোধ ছেড়ে মানবিক জীবনকে আঁকড়ে ধরে রচিত এ সকল কাব্যে ধর্মের চেয়ে কর্ম এবং দেবতার চেয়ে মানুষকে অধিক প্রাধান্য দান করেছে। রোমন্সরস পরিবেশনের নিমিত্তে অলৌকিক মায়াবাস্তবতার জাল বিস্তার করা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষই কাব্যসমূহের নায়ক। প্রেম ও সৌন্দর্যের অনন্য মিশেলে সৃষ্ট প্রণয়কাব্যসমূহ প্রতিভাধর কবিদের আত্মস্বাতন্ত্র্যে, আভিজাত্যে, মননশীল ভাষাচৈতন্যে, প্রসারণশীল শব্দায়নে, আলঙ্কারিক পাণ্ডিত্য প্রমাণে ও কুশলী কৌশলে অসাধারণত্ব লাভ করেছে; যা আজও সংহৃদয় পাঠকের কাব্যরসসুধা পানের তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১. ড. আশরাফ পিন্টু ,আরকান রাজসভায় বাংলাসাহিত্য, দৈনিক ইনকিলাব, ৯ মার্চ ২০১৮
২. সেলিনা হোসেন ও নুরল ইসলাম সম্পাদিত; বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭
৩. নেছার আহমদ ,স্মরণের আবরনে চট্টগ্রামের কৃতী পুরুষ-২য় খন্ড, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০০৯

৪. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খন্ড, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,২০১৩
৫. মধ্যযুগের মুসলিম লেখক ও বাংলা সাহিত্য, দৈনিক নয়া দিগন্ত অনলাইন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৬. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, দৈনিক সমকাল অনলাইন, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৭. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৩
৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম-২য় খন্ড), ঢাকা, ১৯৬৭, ১৯৭৬
৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮
১০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খন্ড), ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭০
১১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম-৫ম খন্ড), ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২
১২. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম-২য় খন্ড),নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৮
১৩. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য , সুচয়নী পাবলিসার্স, ঢাকা , ১৯৮৬